আল কাফিরূন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ আয়াতের "আল কাফিরূন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক যুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহকে (সা) কোন না কোন প্রকারে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এ জন্য তারা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরমূলা নিয়ে হাযির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত বেশী পরিমাণ ধন–সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, থামো! আমি দেখি

আমার রবের পক্ষ থেকে কি হুকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় : قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا الْكَـٰفِرُونَ .... এবং এই সংগে নাযিল হয় : قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَـٰهِلُونَ

"ওদের বলে দাও, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো?" ইবনে আব্বাসের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : "হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে চুম্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।" একথায় এই সূরাটি নাযিল হয়। (আবদ ইবনে হুমাইদ)

আবুল বখতরীর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে : "হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা তোমার মাবুদদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চাইতে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।" একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফেরুন সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এই বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন। (আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।)

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবটিকে কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করেছিলেন। এবং (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যায়ের ছিল যেমন কোন অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোন অবাস্তব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, আমি আপনাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যা কিছু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অস্বীকার করলে লোকেরা বরাবর পীড়াপীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, ওপর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিরোধী তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে।

নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন চুক্তি ও আপোশ করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপদেশ দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তরভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোন প্রকার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার আপোস বা উদারনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাযিলের সময় কাফের ও মুশরিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি বহুবার রসূলুল্লাহকে (সা) ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে দেখিছি। (এই বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি ঘুমুবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও। আর রসূল (সা) নিজেও যখন বিছানায় ঘুমুবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি। (বায়হাকী, তাবারানি ও ইবনে মারদুইয়া)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও (আবুল ইয়ালা ও তাবারানি)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে বলেন, ঘুমুবার সময় قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে— (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা (রা) এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন— (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ① لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ② وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ③ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ④ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ⑥

বলে দাও, হে কাফেররা![1] আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।[2] আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।[3] আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।[4] তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।[5]

১. এ আয়াতে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো ঃ

(ক) যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তুমি কাফেরদের পরিষ্কার বলে দাও। তবুও সামনের আলোচনা জানিয়ে দিচ্ছে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক মু'মিনের সে কথাগুলোই কাফেরদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এমনকি যে ব্যক্তি কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে তার জন্যও কুফরী ধর্ম, তার পূজা–উপাসনা ও উপাস্যদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই 'কুল' (বলে দাও) শব্দটির মাধ্যমে প্রধানত ও প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ হুকুমটি বিশেষভাবে শুধু তাঁকেই করা হয়নি বরং তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিনকে করা হয়েছে।

(খ) এ আয়াতে প্রতিপক্ষকে যে "কাফের" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের জন্য কোন গালি নয়। বরং আরবী ভাষায় কাফের মানে অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী (Unbeliever)। এর মোকাবিলায় 'মু'মিন' শব্দটি বলা হয়, মেনে নেয়া ও স্বীকার করে নেয়া অর্থে (Beliver)। কাজেই আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হে কাফেররা!) বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, "হে লোকেরা! তোমরা যারা আমার রিসালাত ও আমার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করছো।" অনুরূপভাবে একজন মু'মিন যখন একথা বলবে অর্থাৎ যখন সে বলবে, "হে কাফেররা!" তখন কাফের বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেনি।

(গ) "হে কাফেররা!" বলা হয়েছে, "হে মুশরিকরা" বলা হয়নি। কাজেই এখানে কেবল মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য পেশ করা হয়নি বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে শিক্ষা ও হিদায়াত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত বলে মেনে নেয় না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক বা সারা দুনিয়ার কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক যেই হোক না কেন, তাদের সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধনকে শুধুমাত্র কুরাইশ বা আরবের মুশরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই।

(ঘ) অস্বীকারকারীদেরকে 'হে কাফেররা' বলে সম্বোধন করা ঠিক তেমনি যেমন আমরা কিছু লোককে সম্বোধন করি "ওহে শত্রুরা" বা "ওহে বিরোধীরা" বলে। এ ধরনের সম্বোধনের ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী ব্যক্তিরা লক্ষ্য হয় না, লক্ষ হয় তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা। আর এ সম্বোধন ততক্ষণের জন্য হয় যতক্ষণ তাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকে। যখন তাদের কেউ এ শত্রুতা ও বিরোধিতা পরিহার করে অথবা বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যায় তখন সে আর এ সম্বোধনের লক্ষ থাকে না। অনুরূপভাবে যাদেরকে "হে কাফেররা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও তাদের কুফরীর কারণে এ সম্বোধনের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যক্তি সত্তার কারণে নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমৃত্যু কাফের থাকে তার জন্য এ সম্বোধন হবে চিরন্তন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার প্রতি আর এ সম্বোধন আরোপিত হবে না।

(ঙ) অনেক মুফাস্সিরের মতে এ সূরায় "হে কাফেররা" সম্বোধন কেবলমাত্র কুরাইশদের এমন কিছু লোককে করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীনের ব্যাপারে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা) বলে দিয়েছিলেন, এরা ঈমান আনবে না। দু'টি কারণে তারা এ মত অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, সামনের দিকে বলা হয়েছে لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (যার বা যাদের ইবাদাত তোমরা করো আমি তার বা তাদের ইবাদাত করি না)। তাদের মতে এ উক্তি ইহুদি ও খৃষ্টানদের জন্য সঠিক নয়। কেননা তারা আল্লাহর ইবাদাত করে। দ্বিতীয়ত, সামনের দিকে একথাও বলা হয়েছে ঃ وَلَا أَنْتُمْ عَٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করছি)। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ সূরা নাযিলের সময় যারা কাফের ছিল এবং পরে ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে এ উক্তি সত্য নয়। কিন্তু এ উভয় যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। অবশ্যি এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি পরে করবো। তা থেকে জানা যাবে, এগুলোর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। তবে এখানে এ যুক্তির গলদ স্পষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি, যদি শুধুমাত্র উল্লেখিত লোকদেরকেই এ সূরায় সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সূরার তেলাওয়াত জারী থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে কুরআনে এটি লিখিত থাকারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

২. সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করে, ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, জীবিত ও মৃত মানুষের আত্মা তথা ভূত-প্রেত, চাঁদ, সূর্য, তারা, জীব-জন্তু, গাছপালা, মাটির মূর্তি বা কাল্পনিক দেব-দেবী সবই এর

অন্তরভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে; আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহকেও তো মাবুদ ও উপাস্য বলে মানতো এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও আল্লাহর উপাস্য হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি। আর আহলি কিতাবরা তো আল্লাহকেই আসল মাবুদ বলে মানতো। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রমের উল্লেখ না করেই এদের সমস্ত মাবুদের ইবাদাত করা থেকে সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করা, যেখানে আল্লাহও তার অন্তরভুক্ত, কিভাবে সঠিক হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহকে অন্য মাবুদদের সাথে মিশিয়ে মাবুদ সমষ্টির একজন হিসেবে যদি অন্যদের সাথে তাঁর ইবাদাত করা হয় তাহলে তাওহীদ বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যি নিজেকে এ ইবাদাত থেকে দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করবে। কারণ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ মাবুদ সমষ্টির একজন মাবুদ নন। বরং তিনি একাই এবং একক মাবুদ। আর এ সমষ্টির ইবাদাত আসলে আল্লাহর ইবাদাত নয়। যদিও আল্লাহর ইবাদাত এর অন্তরভুক্ত। কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে একমাত্র সেটিই আল্লাহর ইবাদাত যার মধ্যে অন্যের ইবাদাতের কোন গন্ধও নেই এবং যার মধ্যে মানুষ নিজের বন্দেগীকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে।

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ (البينة : ٥)

"লোকদেরকে এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা পুরোপুরি একমুখী হয়ে নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর ইবাদাত করবে।

কুরআনের বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসা ১৪৫ ও ১৪৬, আল আ'রাফ ২৯, আয যুমার ২, ৩, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং আল মু'মিন ১৪ ও ৬৪-৬৬ আয়াতসমূহ। এ বক্তব্য একটি হাদীসে কুদসীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শরীকের অংশীদারিত্ব থেকে আমি সবচেয়ে বেশী মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করেছে যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, তা থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আমার সাথে যাকে সে ঐ কাজে শরীক করেছে, ঐ সম্পূর্ণ কাজটি তারই জন্য (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)। কাজেই আল্লাহকে দুই, তিন বা বহু ইলাহের একজন গণ্য করা এবং তাঁর সাথে অন্যদের বন্দেগী, উপাসনা ও পূজা করাই হচ্ছে আসল কুফরী এবং এ ধরনের কুফরীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করাই এ সূরার উদ্দেশ্য)

৩. এখানে মূলে مَا اَعْبُدُ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় مَا (মা) শব্দটি সাধারণত নিষ্প্রাণ বা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বস্তু বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন জীবের জন্য مَنْ (মান) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ কারণে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে مَنْ اَعْبُدُ না বলে مَا اَعْبُدُ বলা হলো কেন? মুফাস্সিরগণ সাধারণত এর চারটি জবাব দিয়ে থাকেন। এক, এখানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, এখানে مَا শব্দটি اَلَّذِىْ (আললাযী) অর্থাৎ যে বা যাকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিন, উভয়, বাক্যেই مَا শব্দটি মূল শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এখানে এর অর্থ হয় ঃ আমি সেই ইবাদাত করি না যা তোমরা করো। অর্থাৎ মুশরিকী ইবাদাত। আর

তোমরা সেই ইবাদাত করো না যা আমি করি অর্থাৎ তাওহীদবাদী ইবাদাত। চার, প্রথম বাক্যে যেহেতু مَا تَعْبُدُوْنَ বলা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বাক্যে বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে مَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একই শব্দ বলা হয়েছে কিন্তু এর মানে এক নয়। কুরআন মজীদে এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

"যে ব্যক্তি তোমার ওপর বাড়াবাড়ি করে তুমিও তার ওপর তেমনি বাড়াবাড়ি করো যেমন সে তোমার ওপর করেছে।"

একথা সুস্পষ্ট যে, কারো বাড়াবাড়ির জবাবে ঠিক তেমনি বাড়াবাড়িমূলক আচরণকে আসলে বাড়াবাড়ি বলে না। কিন্তু নিছক বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই জবাবী কার্যকলাপকে বাড়াবাড়ি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা তাওবার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ "তারা আল্লাহকে ভুলে গেলো কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেলেন।" অথচ আল্লাহ ভোলেন না। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়ার জবাবে আল্লাহ ভুলে যাওয়া শব্দটি নিছক বক্তব্যের মধ্যে মিল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এ চারটি অর্থ যদিও এক এক দৃষ্টিতে যথার্থ এবং আরবী ভাষায় এসব অর্থ গ্রহণ করার অবকাশও রয়েছে তবুও যে মূল বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য مَنْ أَعْبُدُ এর জায়গায় مَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে তা এর মধ্য থেকে কোন একটি অর্থের মাধ্যমেও পাওয়া যায় না। আসলে আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির জন্য مَنْ শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং مَا শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার গুণগত সত্তা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আমাদের ভাষায় কারো সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তখন তার ব্যক্তি সত্তার পরিচিতি লাভ করাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি, ইনি কি? তখন আসলে আমরা চাই তার গুণগত পরিচিতি। যেমন তিনি যদি সেনাবাহিনীর লোক হন তাহলে সেখানে তার পদমর্যাদা কি? তিনি যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাহলে সেখানে তিনি রীডার, লেকচারার না প্রফেসর কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তিনি কোন্ বিষয়টি পড়ান? তার ডিগ্রী কি ইত্যাদি বিষয় জানাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যদি এ আয়াতে বলা হতো لَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَنْ أَعْبُدُ তাহলে এর অর্থ হতো, তোমরা সেই সত্তার ইবাদাত করবে না যার ইবাদাত আমি করছি। এর জবাবে মুশরিক ও কাফেররা বলতে পারতো ঃ আল্লাহর সত্তাকে তো আমরা মানি এবং তার ইবাদাতও করি। কিন্তু যখন বলা হলো ঃ لَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ তখন অর্থ দাঁড়ালো ঃ যেসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত আমি করি সেইসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত তোমরা করবে না। এখানে মূল বক্তব্য এটিই। এরি ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন সব ধরনের কাফেরদের দীন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। কারণ সব ধরনের কাফেরদের খোদা থেকে তাঁর খোদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কারো খোদার ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সে বিশ্ব–জগতের প্রভু

নয় বরং ইসরাঈলের প্রভু। একটি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে তার এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের সাথে নেই। সে হযরত ইয়াকুবের সাথে কুস্তি লড়ে কিন্তু তাকে আছাড় দিতে পারে না। তার উযাইর নামক একটি ছেলেও আছে। আবার কারো খোদা হযরত ঈসা মসিহ নামক একমাত্র পুত্রের পিতা। সে অন্যদের গুণাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য নিজের পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করায়। কারোর খোদার স্ত্রী–সন্তান আছে। কিন্তু সে বেচারার শুধু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার কারো খোদা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষের দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে এবং মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারো খোদা নিছক অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সকল কার্যকারণের কারণ কিংবা প্রথম কার্যকারণ (First Cause)। বিশ্ব–জগতের ব্যবস্থাপনাকে একবার সচল করে দিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বিশ্ব–জাহান ধরাবাধা আইন মুতাবেক স্বয়ং চলছে। অতপর মানুষের সাথে তার ও তার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, খোদাকে মানে এমন সব কাফেরও আসলে ঐ আল্লাহ মানে না যিনি সমগ্র বিশ্ব–জাহানের একক স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থাপনার শুধু স্রষ্টাই নন বরং তার সার্বক্ষণিক পরিচালক। তাঁর হুকুম এখানে প্রতি মুহূর্তেই চলছে। তিনি সকল প্রকার দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তিনি সব রকমের উপমা ও সাকার সত্তা থেকে পবিত্র, নজীর, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য মুক্ত এবং কোন সাথী, সহকারী ও অংশীদারের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও মাবুদ হবার অধিকারে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তাঁর সন্তানাদি থাকা, কাউকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এবং কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিটি সত্তার সাথে রিজিকদাতা, পালনকর্তা, অনুগ্রহকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। জীবন–মৃত্যু, লাভ–ক্ষতি এবং ভাগ্যের ভাঙা–গড়ার পূর্ণ ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের সৃষ্টির কেবল পালনকর্তাই নন বরং প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিদায়াতও দান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল এতটুকুই নয় যে, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর পূজা অর্চনাকারী বরং তিনি নিজের নবী ও কিতাবের সাহায্যে আমাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করেন এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার আমাদের ওঠাবেন এবং আমাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মাবুদের ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ করছে না। অন্যেরা খোদার ইবাদাত করলেও আসল ও প্রকৃত খোদার ইবাদাত করছে না। বরং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত কাল্পনিক খোদার ইবাদাত করছে।

৪. একদল তাফসীরকারের মতে এ বাক্য দু'টিতে প্রথম বাক্য দু'টির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে অত্যধিক শক্তিশালী ও বেশী জোরদার করার জন্য এটা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্সির একে পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, এর মধ্যে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে একথার বক্তব্যই আলাদা। আমার মতে, এ বাক্য দু'টিতে আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এতটুকু কথা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়।

কারণ এখানে শুধুমাত্র "আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি" একথাটুকুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর আগের বক্তব্যে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছিল এখানে সে অর্থে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করার পর মুফাস্‌সিরগণের এ দলটি এ দু'টি বাক্যের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা পরস্পর অনেক ভিন্নধর্মী। এখানে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করে তার ওপর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশংকায় শুধুমাত্র আমার মতে যে অর্থটি সঠিক সেটিই এখানে বর্ণনা করলাম।

প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।" এর বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আর আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" এ দু'টি বক্তব্যে দু'টি দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক, আমি অমুক কাজ করি না বা করবো না বলার মধ্যে যদিও অস্বীকৃতি ও শক্তিশালী অস্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু আমি উমুক কাজটি করবো না একথার ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, সেটা এত বেশী খারাপ কাজ যে, সেটা করা তো দূরের কথা সেটা করার ইচ্ছা পোষণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুই, "যাদের ইবাদাত তোমরা করো" একথা বলতে কাফেররা বর্তমানে যেসব মাবুদদের ইবাদাত করে শুধুমাত্র তাদেরকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষে "যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো" বললে এমনসব মাবুদদের কথা বুঝায় যাদের ইবাদাত কাফেররা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে করেছে। একথা সবাই জানে, মুশরিক ও কাফেরদের মাবুদদের মধ্যে হামেশা রদবদল ও কমবেশী হতে থেকেছে। বিভিন্ন যুগে কাফেরদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের পূজা করেছে। সবসময় ও সব জায়গায় সব কাফেরের মাবুদ কখনো এক থাকেনি। কাজেই এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের শুধু আজকের মাবুদদের থেকে নয়, তোমাদের পিতৃপুরুষদের মাবুদদের থেকেও দায়মুক্ত। এ ধরনের মাবুদদের ইবাদাত করার চিন্তাও মনের মধ্যে ঠাঁই দেয়া আমার কাজ নয়।

আর দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাপারে বলা যায়, যদিও ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত এ বাক্যটির শব্দাবলী ও ৩ নম্বর আয়াতের শব্দাবলী একই ধরনের তবুও এদের উভয়ের মধ্যে অর্থের বিভিন্নতা রয়েছে। তিন নম্বর আয়াত সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে ঃ "আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" তাই এর অর্থ হয়, "আর না তোমরা সেই ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন একক মাবুদের ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।" আর পাঁচ নম্বর আয়াতে এই সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছেঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো।" তাই এর মানে হয়, "আর না তোমরা সেই একক মাবুদের ইবাদাত করবে বলে মনে হচ্ছে যার ইবাদাত আমি করি।" অন্য কথায়, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের যাদের পূজা-উপাসনা করেছো তাদের পূজারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বহু মাবুদের বন্দেগী পরিহার করে একক মাবুদের ইবাদাত করার ব্যাপারে তোমাদের যে বিতৃষ্ণা সে কারণে তোমরা নিজেদের এ ভুল ইবাদাত–বন্দেগীর পথ ছেড়ে দিয়ে আমি যাঁর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত করার পথ অবলম্বন করবে, এ আশাও করি না।

৫. অর্থাৎ আমার দীন আলাদা এবং তোমাদের দীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা–উপাসনা–বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা–উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমার পথ কখনো এক হতে পারে না। এটা কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না—এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে পর পর এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে তাহলে বলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়–দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত।" (৪১ আয়াত) এ সূরাতেই তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" (১০৪ আয়াত) সূরা আশ শু'আরায় বলেছেন ঃ "হে নবী! যদি এরা এখন তোমার কথা না মানে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। (২১৬ আয়াত) সূরা সাবায় বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, আমাদের ত্রুটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলো, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" (২৫–২৬ আয়াত) সূরা যুমার–এ বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" (৩৯–৪০ আয়াত) আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলমানকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি ভালো আদর্শ। (সেটি হচ্ছে ঃ) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" (আল মুমতাহিনা ৪ আয়াত) কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও—"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন"–এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা যুমার–এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আমি তো আমার দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।" (১৪ আয়াত)।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাফেরদের ধর্ম পরস্পর যতই বিভিন্ন হোক না কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাফেররা মূলত একই গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বংশ বা বিবাহের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে এমন কোন সম্পর্ক থাকে যা একের সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারী স্বত্ব দাবী করে তাহলে একজন খৃষ্টান একজন ইহুদীর, একজন ইহুদী একজন খৃষ্টানের এক ধর্মের কাফের অন্য ধর্মের কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لا يتوارث اهل ملتين شتى "দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, দারে কুতনী)। প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে, ইবনে হিব্বান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হুরাইরা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়টি আলোচনা প্রসংগে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম শামসুল আয়েম্মা সারাখসী লিখেছেন ঃ যে সমস্ত কারণে মুসলমানরা পরস্পরের ওয়ারিশ হয় সে সমস্ত কারণে কাফেররাও পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে এমন কোন কোন অবস্থায়ও উত্তরাধিকার স্বত্ব জারী হতে পারে যে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হয় না।.................... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে দু'টি, একটি সত্য দীন এবং অন্যটি মিথ্যা দীন। তাই তিনি বলেছেনঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই সাথে তিনি মানুষদেরও দু'দলে বিভক্ত করেছেন। একদল জান্নাতী এবং তারা হচ্ছে মু'মিন। আর একদল জাহান্নমী এবং সামগ্রিকভাবে তারা হচ্ছে কাফের সমাজ। এ দু'দলকে তিনি পরস্পরের বিরোধী গণ্য করেছেন তাই তিনি বলেছেন ঃ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (এই দু'টি পরস্পর বিরোধী দল। এদের মধ্যে রয়েছে নিজেদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।—আল হজ্জ ১৯ আয়াত) অর্থাৎ সমস্ত কাফেররা মিলে একটি দল। তাদের বিরোধ ঈমানদার বা মু'মিনদের সাথে।..... তাদেরকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা মিল্লাতে তথা মানব গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত বলে আমরা মনে করি না। বরং মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই একটি মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে। অন্যদিকে তারা এসব অস্বীকার করে। এ জন্য তাদেরকে কাফের বলা হয়। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় لا يتوارث اهل ملتين হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে যে কথার উল্লেখ করেছি সেদিকেই ইংগিত করে। কারণ, "মিল্লাতাইন" (দুই মিল্লাত তথা দুই গোষ্ঠী) শব্দের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে করে দিয়েছেন ঃ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ "মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফের হতে পারে না মুসলমানের ওয়ারিশ।" [আল মাবসূত ৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। ইমাম সারাখসী এখানে যে হাদীসটির বরাত দিয়েছেন সেটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।]